বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্য ও জলবায়ু
Natural Landscape and Climate of Bangladesh

৩

ভূমিকা

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। দেশটির আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের মাঝ-বরাবর অতিক্রম করায় এদেশে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। আবার মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে, বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুও বলা হয়। বাংলাপিডিয়ায় বাংলাদেশের মোট নদ-নদীর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৭০০টি। তবে অনেকের মতে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এ সংখ্যাটির উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবে বাংলাদেশে বর্তমানে ৩০০টির মত নদী প্রবাহমান রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৫৮ টি আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। তবে শিল্পদূষণ এবং অবৈধ দখলদারীর কারণে বাংলাদেশের প্রবাহমান নদীগুলোর অধিকাংশই নাব্যতা হারিয়েছে। কোনো কোনো নদী এখন খাল বা ক্যানেল-এ রূপান্তরিত হয়েছে; আবার কিছু নদী কেবল সেচ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলাদেশকে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বেসিন হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ কারণে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ নদীবাহিত পলি দ্বারা গঠিত এক বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি। এছাড়াও রয়েছে জলবায়ুগত ভিন্নতা এবং জীববৈচিত্র্য। আলোচ্য ইউনিটে বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো, জলবায়ু, নদ-নদী, জলবায়ু পরিবর্তন, বনাঞ্চল, জীববৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৫ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৩.১ : বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো
পাঠ ৩.২ : বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদানসমূহ ও এর প্রকৃতি
পাঠ ৩.৩ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা
পাঠ ৩.৪ : বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কৌশল
পাঠ ৩.৫ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য

মুখ্য শব্দ	ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো, জলবায়ুর উপাদান, নদী ব্যবস্থা, জলবায়ু পরিবর্তন, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য

পাঠ-৩.১ বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো
Location and Physiographic Structure of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ বঙ্গখাতের একটি বৃহৎ অংশ এবং পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ। টারশিয়ারি যুগে এই বঙ্গ অববাহিকার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে যার সাথে হিমালয় পর্বতমালা গঠন প্রক্রিয়ার সম্পৃক্ততা রয়েছে। একই সময়ে অর্থাৎ টারশিয়ারি যুগে অপর একটি ভূ-আলোড়নের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, আসাম ও নাগাপাহাড় গঠিত হয়েছে। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

বাংলাদেশ ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি.। বাংলাদেশের মোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১২ কি.মি.। ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কি.মি., মিয়ানমারের সাথে ২৮১ কি. মি. এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কি. মি.। বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২২ কি.মি.) এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০ কি.মি.)। বাংলাদেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা চলে গেছে। ভূ-প্রাকৃতিক এর একক বিবেচনায় বাংলাদেশের পূর্বে রয়েছে নাগা, লুসাই ও আরাকান পর্বতমালা পশ্চিমে রাজমহল মালভূমি ও ভারতের উপদ্বীপীয় ভূ-খণ্ড, উত্তরে শিলং মালভূমি ও হিমালয় পর্বতমালা।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো বৈচিত্র্যময়। দেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ প্রাচীন পলি দিয়ে গঠিত দুর্গম ও অমসৃণ এলাকা। উত্তর ও পূর্বদিকে উচ্চভূমি, টিলা এবং পাহাড়। টারশিয়ারি যুগের পাহাড় এবং প্লাইস্টোসিন যুগের সোপান ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ সমতল ভূমি। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলটি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এদের উপনদী, শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। ভূমির ঢালের প্রবণতা উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী। বাংলাদেশের নদীগুলো প্রায় প্রতি বছর বর্ষার সময় প্লাবিত হয়। এছাড়াও নদীর মোহনাসমূহে পলি অবক্ষেপনের ফলেও ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। যেমন– পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলিত স্রোত প্রায় ১১ কিলোমিটার প্রশস্ত খাঁড়িতে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এই মোহনায় রয়েছে হাতিয়া, শাহাবাজপুর, সন্দ্বীপ ও ভোলা প্রভৃতি উর্বর বাসযোগ্য বড় বড় দ্বীপ। দ্বীপগুলোর কাছে প্রচুর সামুদ্রিক খাঁড়ি রয়েছে। এর মধ্যে পশুর, হরিণঘাটা, মালঞ্চ ও মারজাতা খাঁড়ি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভূ-সংস্থানিক বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামোকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে (প্রবাহ চিত্র: ৩.১.২)। যথা: টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিন যুগের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি ।

প্রবাহ চিত্র: ৩.১.১ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামো

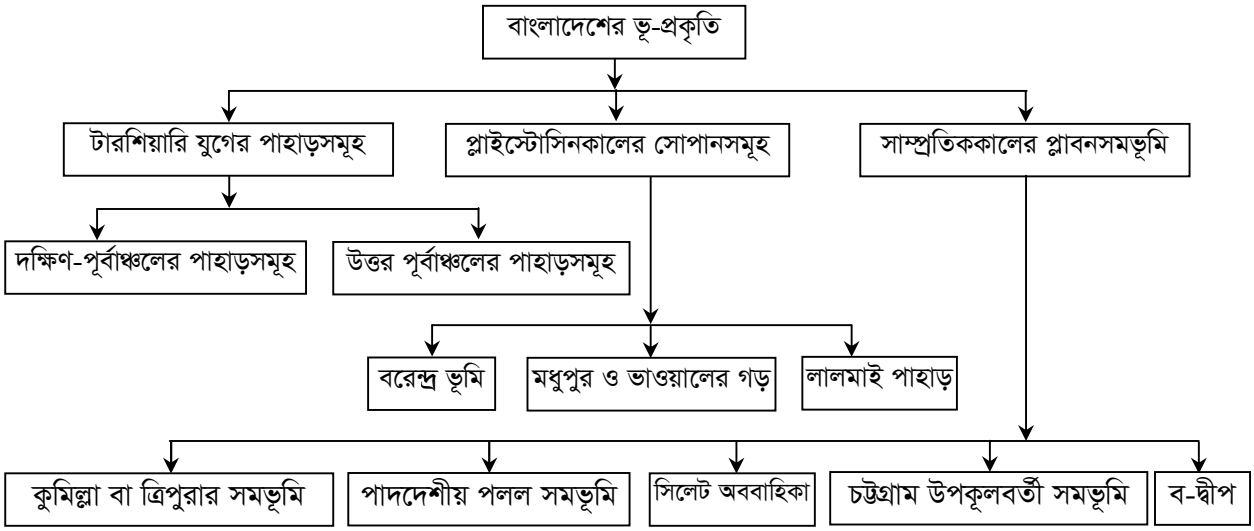

১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ:

টারশিয়ারি যুগের গিরিজনি ভূ-আলোড়নের ফলে আরাকান, লুসাই ও গারো পাহাড় উত্থিত হয়েছিল। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও কুমিল্লার পাহাড়সমূহ উক্ত পাহাড় সমূহের অংশবিশেষ। টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এই পাহাড়সমূহ গঠিত হয়েছে বলে এগুলোকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ও বলা হয়। এই পাহাড়সমূহ ভঙ্গিল পর্বত শ্রেণির এবং বেলে পাথর, শ্লেট পাথর এবং কাদা দিয়ে গঠিত। আলোচনার সুবিধার্থে টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহকে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-

ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়সমূহ নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার হলেও বাংলাদেশের সর্বোচ্চশৃঙ্গ তাজিংডং (১২৩১ মিটার), দ্বিতীয় সর্বোচ্চশৃঙ্গ কেওক্রাডং (১২৩০ মিটার) বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। আরো তিনটি উল্লেখযোগ্য পাহাড় হলো মৌদক তুলাং ৯০৫ মিটার, রেংটিয়াং ৯৫৭ মিটার ।

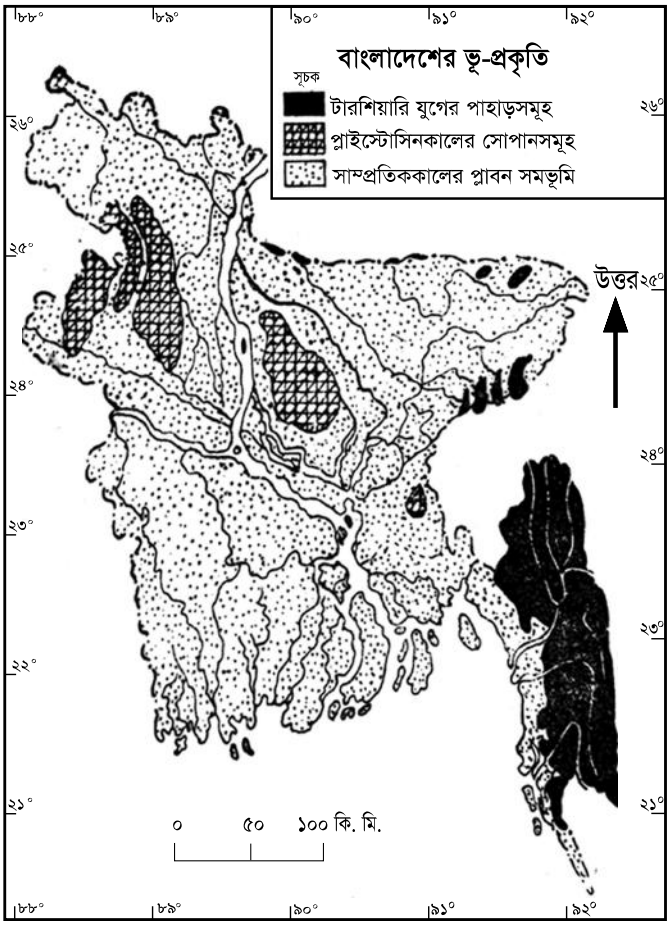

চিত্র: ৩.১.২ বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী হালদা ও নাফ এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী। এছাড়া সীতাকুণ্ড ও বাড়বকুণ্ডে বেশ কিছু উষ্ণ প্রস্রবণ রয়েছে।

খ. উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার পাহাড়গুলো দেশের উত্তর - পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ের অন্তর্ভুক্ত। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০-৯০ মিটারের মধ্যে। তবে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার পূর্ব ও উত্তর পূর্বাংশের পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটার। টিলাজাতীয় পাহাড়গুলো মূলত ভারতের মেঘালয় রাজ্যের খাসিয়া, জয়ন্তিকা, গারো ও লুসাই পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ। আবার ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরে সুসাং নামক পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। এ অঞ্চলে সুরমা, কুশিয়ারা, ও কালনী নদী সিলেটের মধ্য দিয়ে এবং কংস নদী ময়মনসিংহের পাহাড়িয়া অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ:

এই অঞ্চলের আয়তন ১৩,৪২৭ বর্গ কিলোমিটার। আলোচনার সুবিধার্থে প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক) বরেন্দ্রভূমি, খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় গ) লালমাই পাহাড়।

ক) বরেন্দ্রভূমি : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর নিয়ে বরেন্দ্রভূমি অঞ্চল গঠিত। এর আয়তন ৯,২৮৮ বর্গ কিলোমিটার। প্লাবন সমভূমি থেকে বরেন্দ্রভূমি প্রায় ৬-১২ মিটার উঁচু। এই অঞ্চলের প্রধান নদী পুনর্ভবা, আত্রাই ও যমুনা।

খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত জেলাসমূহ হলো ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর। মোট আয়তন ৪,১০৩ বর্গ কিলোমিটার। মধুপুর ও ভাওয়াল গড়ের দক্ষিণাংশকে বলা হয় ভাওয়ালের গড় যা গাজীপুর জেলায় অবস্থিত এবং উত্তরাংশকে বলা হয় মধুপুর গড় যা টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত। বংশী, শীতলক্ষ্যা, বানার, বালু, সুতিয়া, তুরাগ ও লৌহজং প্রভৃতি নদী এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

গ) লালমাই পাহাড়: লালমাই পাহাড় অঞ্চলের আয়তন মাত্র ৩৪ বর্গকিলোমিটার যা কুমিল্লা জেলা শহর থেকে ৮ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এই অঞ্চলটি প্রকৃতপক্ষে দুইটি চ্যুতির মধ্যবর্তী 'হোস্ট' নামক উন্নত ভূ-ভাগ।

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর পলি দ্বারা গঠিত প্লাবনভূমিকে সাম্প্রতিক কালের প্লাবন সমভূমি ধরা হয়। এর আয়তন ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার। প্রাকৃতিক বাঁধ, পশ্চাদ ঢাল, পশ্চাদ জলাভূমি, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, চর প্রভৃতি এই প্লাবনভূমির বৈশিষ্ট্য। সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ জেলা, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার মধ্যাংশ, বগুড়ার পূর্বাংশ, টাঙ্গাইল জেলার পশ্চিম অংশ, ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ অংশ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার উত্তরাংশ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ স্থান সাম্প্রতিক কালের প্লাবনভূমির অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১। **কুমিল্লার বা ত্রিপুরার সমভূমি :** কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলার অধিকাংশ, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ এই সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। এর আয়তন ৭,৪৩৩ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ অঞ্চলের উচ্চতা ৩.৬-৬ মিটার। সালদা, বুড়ি, গোমতি ও ডাকাতিয়া এই অঞ্চলের প্রধান নদী। তবে নদীখাদ তেমন গভীর নয়।

২। **পাদদেশীয় পলল সমভূমি :** পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা জেলার পাদদেশীয় পলল সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। তিস্তা, করতোয়া ও আত্রাই এই সমভূমির প্রধান নদী। সমুদ্র সমতল থেকে এর উচ্চতা ৩০.৫ মিটার। পাদদেশীয় পলল সমভূমির মোট আয়তন প্রায় ৪,০০০ বর্গকিলোমিটার।

৩। **সিলেট অববাহিকা :** সিলেট জেলার অধিকাংশ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জ জেলার সামান্য অংশ নিয়ে সিলেট অববাহিকা গঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। দেশের বৃহত্তম হাওড় হাকালুকি এই অঞ্চলে অবস্থিত। বর্ষাকালে প্রতিবছর এই অঞ্চল প্লাবিত হয়।

৪। **চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী সমভূমি :** এই সমভূমি অঞ্চলটি ফেনী নদী হতে শুরু করে কক্সবাজারের কিছু দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালি প্রভৃতি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য নদী।

৫। **ব-দ্বীপঃ** বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমভূমিকে ব-দ্বীপ বলা হয়। এই ব-দ্বীপ অঞ্চলকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

ক) সক্রিয় ব-দ্বীপঃ মেঘনা হতে পশ্চিমে গড়াই-মধুমতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমির পূর্ব অংশকে সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল বলে।

খ) মৃত প্রায় ব-দ্বীপঃ গড়াই-মধুমতি নদীর পশ্চিমাংশের সমভূমিকে মৃত-প্রায় ব-দ্বীপ বলা হয়।

গ) স্রোতজ বনভূমিঃ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব-দ্বীপের যে অংশ জোয়ার ভাঁটা দ্বারা প্রভাবিত হয় তাকে স্রোতজ সমভূমি বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার। এর অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল। এ দেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা বিস্তৃত। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়, প্লাইস্টোসিনকালের সোপান এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। পাহাড়ী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ প্রাচীন ও সাম্প্রতিককালের নদীবাহিত পলল অবক্ষেপণের মাধ্যমে প্লাবন সমভূমি গঠন করেছে।

পাঠ-৩.২ বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদানসমূহ ও এর প্রকৃতি
Elements and Nature of Climate of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ুর উপাদানসমূহ সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জলবায়ুর উপাদানসমূহ

যে কোনো স্থানের বায়ুমণ্ডলের স্বল্পকালীন (প্রতি দিনের বা প্রতি ঘন্টার) অবস্থাকে আবহাওয়া বলা হয়। অপরদিকে কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের (কমপক্ষে ৩০-৪০ বছরের) গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। তাই আবহাওয়ার ন্যায় জলবায়ুরও প্রধান উপাদানসমূহ হচ্ছে বায়ু ও বায়ুর চাপ, বায়ুর গতি, সৌরবিকিরণ, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, রৌদ্রময়তা, তুষার, ঝড়, ইত্যাদি। এ সকল উপাদান জীব ও উদ্ভিদের সকল কার্যকলাপের উপর প্রভাবক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে আসছে। মোটকথা, পৃথিবীর সকল প্রকার জীব ও উদ্ভিদের জন্ম-মৃত্যু, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি ও কর্মদক্ষতা ইত্যাদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জলবায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশের জলবায়ুর উপাদানসমূহের বিবরণ দেওয়া হলো:

ক) তাপমাত্রা: স্থান ও সময়ভেদে বাংলাদেশের সর্বত্র তাপমাত্রা বা উষ্ণতার ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর নভেম্বর মাস হতে ফেব্রুয়ারি বা অনেক সময় মার্চের শেষ পর্যন্ত সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করায় সূর্য রশ্মি তির্যকভাবে পতিত হয় ফলে তাপমাত্রা কমে যায়। ফলে শীতের আধিক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়।

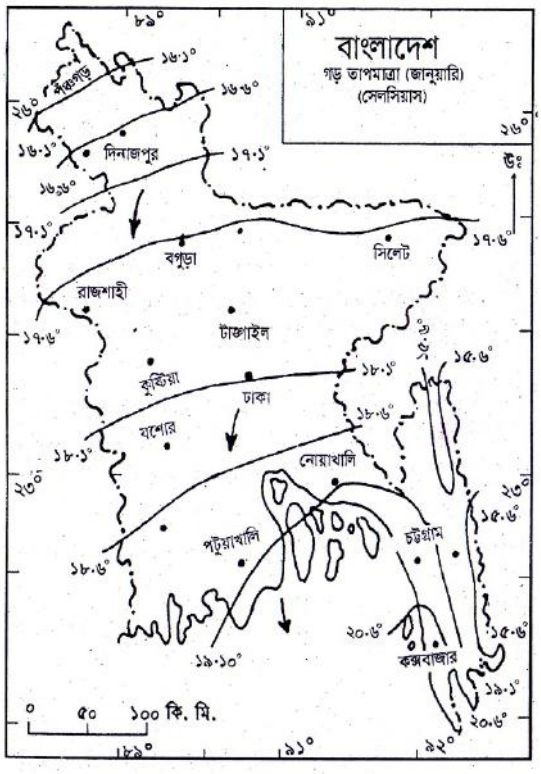

চিত্র: ৩.২.১ সমোষ্ণরেখা

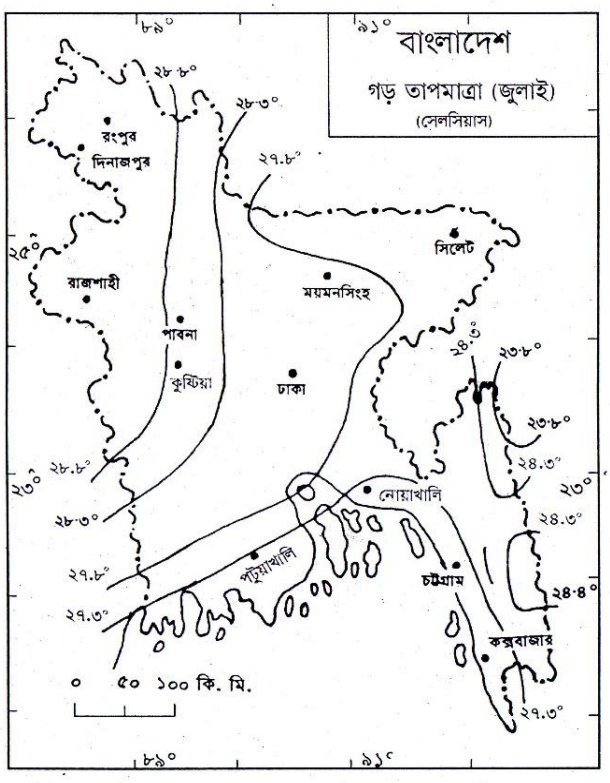

চিত্র: ৩.২.২ সমোষ্ণরেখা (জুলাই)

তাই নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়কালকে শীতকাল বলা হয়। এই সময় গড়ে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সাধারণত জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ মাসে গড় তাপমাত্রা থাকে ১৭.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালে দেশের উপকূলভাগ থেকে উত্তরদিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। এ সময় চট্টগ্রামে ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ঢাকায় ১৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও দিনাজপুরে ১৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। তবে দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা কমে ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা কখনো কখনো তারও নিচে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চলে আসে। এ সময় রাজশাহীতে গড়ে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও ঈশ্বরদীতে গড়ে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা পরিলক্ষিত হয় (আবহাওয়া অধিদপ্তর, ২০২০) (চিত্র: ৩.২.১, ৩.২.২)। মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত সূর্য উত্তর গোলার্ধে অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে সূর্যরশ্মি খাড়াভাবে পতিত হয়। ফলে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সময়কালকে গ্রীষ্মকাল বলা হয়। এই সময়ে গড় তাপমাত্রা ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে। সাধারণত এপ্রিল বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস। এ সময় সমুদ্র উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে তাপমাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পায়। এ সময় কক্সবাজার ও চট্টগ্রামে গড়ে ৩০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, লালপুরে (ঈশ্বরদী) ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাজশাহীতে যথাক্রমে ৪৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। গ্রীষ্মকালেই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বিদ্যমান। ফলে আবহাওয়ার মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করে এবং পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কালবৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হয় যা গ্রীষ্মকালীন জলবায়ুর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

শীত ও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল ধরা হয় যা জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা বছরের মোট ৮০% বৃষ্টিপাত এ সময় হয়ে থাকে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে একে মৌসুমী বৃষ্টিপাতও বলা হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু সারা বর্ষা মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে তাপমাত্রা বিরূপ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশে তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

বৃষ্টিপাত : শীতকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বলে জলীয়বাষ্প প্রায় থাকে না বললেই চলে। তবে হিমালয় পর্বতের উপর দিয়ে আসার সময় তুষার কণা হতে সামান্য জলীয়বাষ্প বহন করে যা দেশের পূর্বাঞ্চলে পর্বতসমূহে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়।

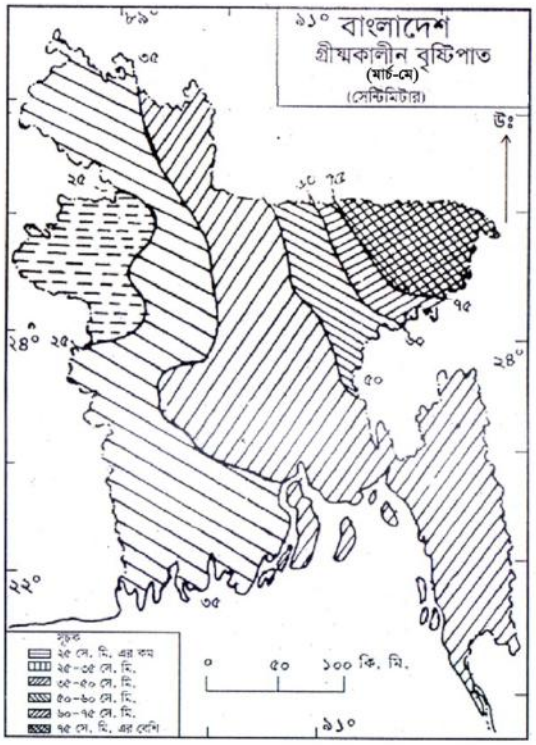

চিত্র: ৩.২.৩ গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত

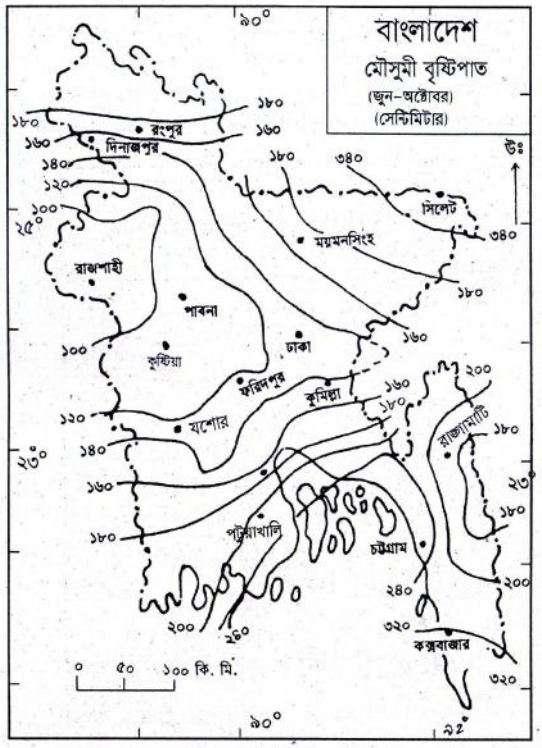

চিত্র: ৩.২.৪ মৌসুমী বৃষ্টিপাত

শীতকালীন বৃষ্টিপাত মূলত উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলেই হয়ে থাকে। এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থানভেদে গড়ে ৫.১৫ সেন্টিমিটার। তাছাড়া পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিক থেকে আগত নিম্নচাপের প্রভাবেও কোনো কোনো বছর কয়েক দিনব্যাপী আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং এর কারণে সিলেট, মৌলভীবাজার, রাঙামাটি জেলার পূর্বাংশ, বান্দরবান জেলার উত্তর পূর্বাংশ এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ১২-১৫ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে (চিত্র: ৩.২.৩, ৩.২.৪)।

গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখীর প্রভাবে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাত হয়। গ্রীষ্মকালীন গড় বৃষ্টিপাত ৫১ সেন্টিমিটার এবং সিলেট জেলাতে এসময় সর্বাপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয় যার পরিমাণ ৭৫ সেন্টিমিটার বা অধিক এবং রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে কম (প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার) বৃষ্টিপাত হয়। দেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের এক পঞ্চমাংশ বৃষ্টি এ সময়ে সংঘটিত হয়।

বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রচুর জলীয় বাষ্প বহন করে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। আবার অধিক তাপমাত্রার ফলে দেশের সর্বত্র যে মজুদ পানি থাকে বাষ্পীভূত হয়ে মৌসুমী বায়ুর সঙ্গে সংযুক্ত করে। ফলে মৌসুমের প্রায় প্রতিদিনই পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া বিদ্যমান জলীয়বাষ্প পূর্ণ বায়ু পর্বতগাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়েও বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ কারণে বাংলাদেশের পাহাড়ী জেলাসমূহে (সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি ও বান্দরবান) প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ সময়ে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১১৯ সেন্টিমিটার এবং সর্বোচ্চ ৩৪০ সেন্টিমিটার। বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চারভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে।

বায়ুপ্রবাহ : নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দেশের পশ্চিমাঞ্চলের দিকে এবং উত্তর দিক থেকে পূর্বাঞ্চলের দিকে বায়ু প্রবাহিত হয়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের অর্ধেক অঞ্চলে দক্ষিণ পশ্চিমা এবং পূর্বাংশের অর্ধেক অঞ্চলে দক্ষিণ-পূর্ব বায়ু প্রবাহিত হয়। কখনও কখনও কালবৈশাখী ঝড়ের প্রভাবে বায়ু প্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সকল বায়ু দক্ষিণমুখী হয়ে প্রবাহিত হয়। অক্টোবরে বায়ু প্রবাহে পরিবর্তন হয়। গ্রীষ্মকালে অপেক্ষাকৃত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে এ সময় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক ও শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি হয় যা কালবৈশাখী নামে অভিহিত। আবার জুন মাসে সূর্য বাংলাদেশের উপর অবস্থান করায় বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে ফলে উত্তর-পূর্ব বায়ুপ্রবাহ স্থিমিত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

বায়ুমণ্ডলের চাপ : শীতকালীন সময়ে (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি) উচ্চচাপ বিরাজ করে যেমন জানুয়ারি মাসের গড় চাপ ১০২০ মিলিবার যা নির্দিষ্ট এক উচ্চচাপ অঞ্চল সৃষ্টি করে। পরবর্তী মাসসমূহে লক্ষণীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। মার্চ মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি করে যার গড় ১০০৫ মিলিবার। বাতাসের বিপরীতমূখী প্রবাহের কারণে মে জুন মাসে চাপের পরিবর্তন ঘটে এবং অক্টোবর-নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি করে থাকে।

বাতাসের আর্দ্রতা : বাংলাদেশে গড় আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বছরে গড়ে ৭৮.১০ শতাংশ। এ জন্য শীতকালে বাংলাদেশের প্রায় সবগুলো জেলায় কুয়াশা, শিশির ও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়। তাছাড়া উপকূলীয় অঞ্চলে নিম্নচাপ সৃষ্টির কারণে সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি সংঘটিত হয়। সাধারণত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে সর্বনিম্ন আর্দ্রতা ৫৭ শতাংশ ধরা হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি : উপরের আলোচনা হতে বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান তিনটি প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। যথা শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। সাধারণত বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। আবার মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুও বলা হয়। ক্রান্তীয় জলবায়ুর প্রধান প্রকৃতি হলো বছরের বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ঋতু যথা গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্তের আবির্ভাব। শীতপ্রধান এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো বাংলাদেশের তাপমাত্রা কখনই চরমভাবাপন্ন হয় না। বাংলাদেশে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। তবে সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত রাজশাহী অঞ্চলের লালপুরে (১১৭.৫ সেন্টিমিটার) এবং সর্বোচ্চ গড় বৃষ্টিপাত সিলেট অঞ্চলের লালখানে (৬৩৭.৫ সেন্টিমিটার) পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের জলবায়ুর অন্যান্য প্রকৃতিগুলো নিম্নে দেওয়া হলো:

১। বাংলাদেশের জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা এবং শীতকালে শুষ্কতা পরিলক্ষিত হয়।

২। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং প্রায়ই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা দেখা দেয়।

৩। বাংলাদেশের জলবায়ুতে বিভিন্ন ঋতুতে উচ্চ তাপমাত্রা, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, অতিরিক্ত আর্দ্রতা ইত্যাদি বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

৪। ষড়ঋতুর দেশ বলে পরিচিত হলেও মূলত শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিনটি ঋতুর প্রাধান্যই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

৫। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকাল আর্দ্র হলেও স্বল্প বৃষ্টিপাত ও ঝড় সংঘটিত হয়।

৬। তবে সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বন্যা এবং সাইক্লোন ও জলোচ্ছাসের মাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীতকালে গড় তাপমাত্র হ্রাস এবং কখনো কখনো বৃষ্টিপাতকেও অনেকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বলে উল্লেখ করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

কোনো স্থানের বা অঞ্চলের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে। জলবায়ুর প্রধান উপাদানগুলো হচ্ছে বায়ুর চাপ, বায়ুর গতি, সৌর বিকিরণ, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মেঘাচ্ছন্নতা ইত্যাদি। জলবায়ুর উপাদানগুলোর তারতম্যের ভিত্তিতে জলবায়ুর প্রকৃতিতেও ভিন্নতা লক্ষণীয়। বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতির প্রধান তিনটি স্বতন্ত্রতা হচ্ছে শীতকাল, গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল। সাধারণত বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় দেশে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। আবার মৌসুমী বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর উপর এত বেশি যে বাংলাদেশের জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমী জলবায়ুও বলা হয়।

পাঠ-৩.৩ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা
River System of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। প্রধান তিনটি নদীসহ প্রায় ৩০০ টি নদী নিয়ে বাংলাদেশে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের নদ-নদীর মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪,১৪০ কি.মি.। সাধারণত বৃহৎ নদী ও এর শাখা নদী ও উপনদীসমূহ মিলে একটি নদী ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের নদী-নালাগুলো দেশের সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। দেশের উত্তরভাগের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিণভাগের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে নদ-নদীর সংখ্যা এবং আকার উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র: ৩.৩.১)। বাংলাদেশের নদীমালার মধ্যে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ বিশ্বের ২২তম (২,৮৫০ কি.মি.) এবং গঙ্গা নদী ৩০তম (২,৫১০ কি.মি.) হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

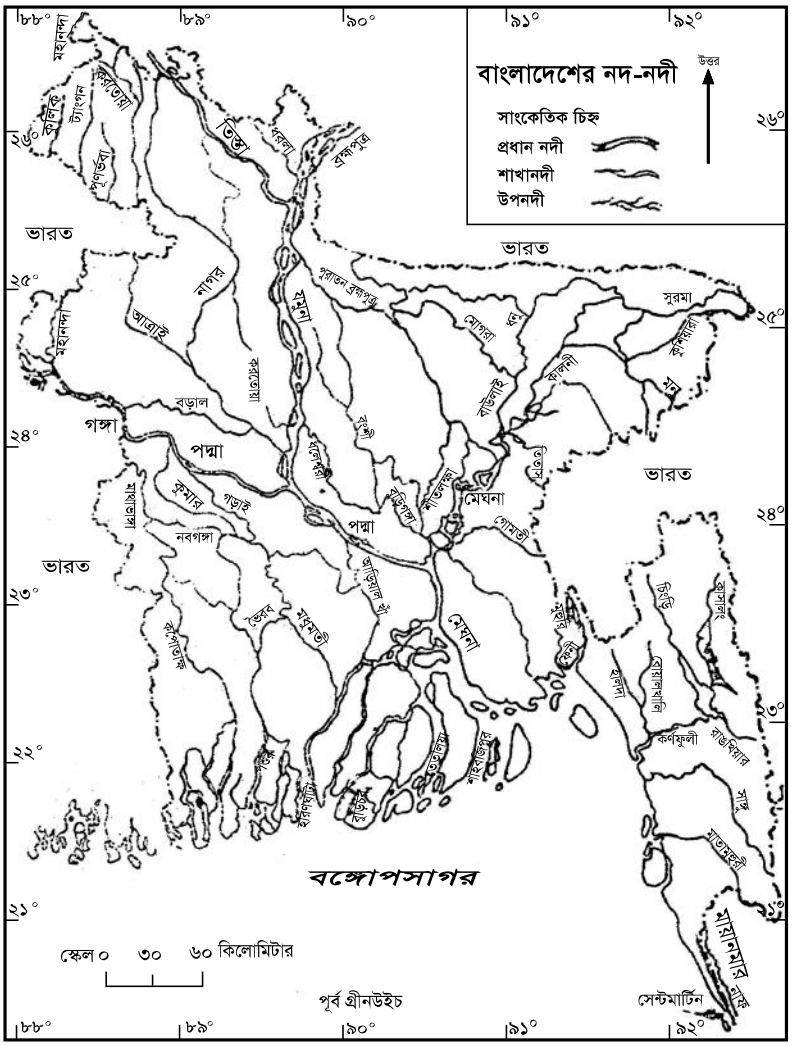

চিত্র: ৩.৩.১ বাংলাদেশের নদ নদী

বাংলাদেশের নদীসমূহকে চারটি প্রধান নদী ব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়; যথা:

১) ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা;
২) গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা;
৩) সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা এবং
৪) চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদী ব্যবস্থা।

১. ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা: ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ এর প্রধান উপনদী তিস্তা ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাখানদী-উপনদী সহযোগে দেশের বৃহত্তম এই নদী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই নদী প্রণালী অববাহিকায় দেশের বৃহত্তম প্লাবনভূমি অবস্থিত। এই নদী-প্রণালীর নিষ্কাশন এলাকার আয়তন ৫,৭৩,৫০০ বর্গ কি.মি। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোতধারা যমুনা নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। যমুনার শাখা নদী হলো ধলেশ্বরী ও বুড়িগঙ্গা এবং উপনদীগুলো হলো তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, বাঙ্গালী, কালজালি, ডোরসা, যমুনেশ্বরী, গঙ্গা, তুলসী গঙ্গা, বড়াল, নারদ ইত্যাদি।

২. গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা: এটি বৃহত্তর গঙ্গা নদী প্রণালীর একটি অংশ। গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে। নির্গত ভাগীরথী এবং মধ্য হিমালয়ের নন্দীদেবী শৃঙ্গের উত্তরে অবস্থিত গুরওয়াল থেকে উৎপন্ন অলোকনন্দা নদীর মিলিত ধারা ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পৌঁছেছে। গঙ্গা কুষ্টিয়া ও রাজশাহী জেলার মাঝখান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর এর নাম হয়েছে পদ্মা। পদ্মার মোট দৈর্ঘ্য ৩২৪ কি.মি.। গঙ্গার উত্তরের প্রধান উপনদী মহানন্দা। অপরদিকে নাগর, টাঙ্গন, পুনর্ভবা ও কুলিক মহানন্দার উপনদী। বড়াল গঙ্গার বামতীরের শাখানদী। গঙ্গার আরেকটি শাখানদী ইছামতি। এটি পাবনা শহরের দক্ষিণে গঙ্গা থেকে বের হয়ে পাবনা শহরকে দু'ভাগ করে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। গঙ্গা থেকে উৎপন্ন অন্যান্য শাখা নদীসমূহ হলো ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, কুমার, মধুমতি, কপোতাক্ষ, পশুর, কীর্তনখোলা, নবগঙ্গা, কালীগঙ্গা, চিত্রা, বিষখালী ও আড়িয়াল খাঁ। বলেশ্বরের ধারাসমূহ এবং এদের অসংখ্য শাখানদী সুন্দরবনের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৩. সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা: এই নদী প্রণালীতে অবস্থিত মেঘনার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬৯ কিলোমিটার। মেঘনা নদীর উৎপত্তি ভারতের শিলং ও মেঘালয় পাহাড়ে। ভারতে এর নাম বরাক নদী। সিলেট জেলার অমলশিদ নামক স্থানে বাংলাদেশ সীমান্তে বরাক নদী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নাম ধারণ করেছে। সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর উল্লেখযোগ্য উপনদী হচ্ছে- লুবা, কুলিয়া, শারিগোয়াইন, চালতি নদী, চেনগড় খাল, পিয়াইন, বোগাপানি, যদুকাটা, সোমেশ্বরী ও কংস। কিশোরগঞ্জ জেলার কুলিয়ারচরে সুরমা মেঘনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ত্রিপুরা পাহাড় থেকে আগত একাধিক নদীকে কুশিয়ারা উপনদী হিসেবে গ্রহণ করেছে যাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছে মনু নদী। সুরমার উপনদীগুলোর তুলনায় কুশিয়ারার উপনদী কম খরস্রোতা, তবে আকস্মিক বন্যাপ্রবণ যার অন্যতম কারণ হচ্ছে পাহাড়ী ঢল।

সুরমা কুশিয়ারা মারকুলির কাছে পুনরায় মিলিত হয় এবং মেঘনা নামে ভৈরব হয়ে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরে পদ্মা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ত্রিপুরা পাহাড় থেকে উৎপন্ন গোমতী ও খোয়াই নদী মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সুরমা-মেঘনা নদী প্রণালীর নিষ্কাশন এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৮০২,০০০ বর্গ কি.মি যার মধ্যে ৩৬,২০০ বর্গ কি.মি বাংলাদেশে অবস্থিত। মেঘনা নদীর গতিপ্রবাহকে সুস্পষ্টভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়– ভৈরববাজার থেকে ষাটনল পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত স্বল্প দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট প্রবাহকে আপার মেঘনা এবং ষাটনল থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রবাহপথকে লোয়ার মেঘনা নামে অভিহিত করা হয়।

মেঘনার একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখানদী তিতাস। মেঘনার অন্যান্য শাখানদীগুলি হচ্ছে পাগলী, কাটালিয়া, ধনাগোদা, মতলব এবং উদামদি। মেঘনা ও এর শাখানদীগুলি ত্রিপুরার পাহাড়ি এলাকার গোমতী, হাওড়া, কাগনী, সিনাই, বুড়ি, হরি, মঙ্গল, কাকরী, পাগলী, কুরলিয়া, বালুজুড়ি, সোনাইছড়ি, হান্দাছোড়া, জাঙ্গালিয়া ও দুরদুরিয়াসহ অসংখ্য স্রোতধারার জলরাশি লাভ করে থাকে। মেঘনার প্রধান উপনদীগুলো হলো শীতলক্ষ্যা, গোমতি, ডাকাতিয়া, ধলেশ্বরী ও ব্রহ্মপুত্র।

৪. চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীসমূহ: চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কর্ণফুলী নদী। এটি আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এ নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৭৪ কি.মি.। এ নদী রাঙামাটি এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে

প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হলো কাসালং, হালদা, চেঙ্গী, মাইনী, রাখিয়াং, শিলক, শ্রীমাই এবং বোয়ালখালী ইত্যাদি। কর্ণফুলী নদীতে রাঙামাটির কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। সাঙ্গু নদী মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ে উৎপত্তি লাভ করে বান্দরবান এবং চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর উপনদীগুলো হলো হালদা, চেঙ্গী, মাসলং, সাইনী, কাপ্তাই, রাখিয়াং, ইছামতি, গোয়ালখালী ইত্যাদি।

বাংলাদেশের কৃষির উন্নতি এবং বসতির ক্রমবিকাশ ও বিস্তরণে নদী ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নদী দ্বারা বাহিত পলি দিয়ে গঠিত সমভূমিতে বসতি গড়ে উঠেছে। এছাড়াও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হিসেবে নদীপথ ব্যবহার হচ্ছে। যে কারণে প্রধান প্রধান বন্দর ও শহর নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। ভূমির নিম্ন উচ্চতা ও বন্ধুরতার কারণে পানি অত্যন্ত ধীরে গড়ায় এবং নদীসমূহ সর্পিলপথে এঁকেবেঁকে চলে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত গড়াই-মধুমতির মতো প্রধান নদীসমূহের সমান্তরালে গড়ে উঠেছে। প্রভাবশালীদের দখল এবং নদী তীরবর্তী এলাকায় বিভিন্ন শিল্প-কল-কারখানা ও বসতবাড়ি গড়ে ওঠায় বাংলাদেশের নদীগুলো তার স্বাভাবিক প্রবাহ ও নাব্যতা হরিয়েছে। ফলে এ অঞ্চলের নৌপরিবহণ ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর ক্রমাবনতিশীল পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছে। এ ছাড়া উজানে ভারত নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বাঁধ ও গ্রোয়েনের মাধ্যমে পানির প্রবাহ ভিন্ন দিকে ধাবিত করার ফলে অধিকাংশ নদীতে পানির স্বাভাবিক সরবরাহের পরিবর্তে সিল্ট ও স্যান্ডের মাধ্যমে নদী তার গভীরতা হারাচ্ছে। নদীসমূহ সমগ্র দেশের ভূ-প্রকৃতি, জলসংস্থান, ভূসংস্থান, অর্থনীতি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ এবং প্রাণিজগতের বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় উন্নয়নে এর অবদান অব্যাহত রাখতে হলে বাংলাদেশের নদ-নদীর পানিপ্রবাহ ও নাব্যতা উন্নয়নে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এদেশে অসংখ্য নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে। দেশের নদীসমূহকে চারটি প্রধান নদী ব্যবস্থায় বিভক্ত করা হয়। এগুলো হল: ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী ব্যবস্থা, গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা, সুরমা-মেঘনা নদী ব্যবস্থা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলের নদ-নদীসমূহ। এসব নদী ব্যবস্থায় অনেক শাখানদী এবং উপনদী রয়েছে।

পাঠ-৩.৪ বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন কৌশল
Climate Change and Adaptation Strategy of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ুর পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন

সমগ্র বিশ্বের সামগ্রিক পরিবেশের প্রতি জলবায়ু পরিবর্তন মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান কারণ হলো গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব অনেক বেশি। আইএফআরসি'র বৈশ্বিক দুর্যোগ রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী বিশ্বের ১৭৩টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

তাপমাত্রা বৃদ্ধিঃ আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ০.০০৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলায় অনুভূত হত। কিন্তু বর্তমানে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোতে তাপমাত্রা প্রায় ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠা-নামা করছে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ধারণা সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তাপমাত্রা বাড়ছে। অপরদিকে ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ অনুযায়ী, এক মিটার সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ১৫ শতাংশ ভূখন্ড তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর ২০১৮ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।

লবণাক্ততা বৃদ্ধিঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। লবণাক্ততার কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একটি অংশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বদলে যাচ্ছে। বিগত তিন দশকে খুলনা জেলায় লবণাক্ততা বেড়েছে সবচেয়ে বেশি, ২১ শতাংশ। খুলনার পরেই বাগেরহাট। সেখানে লবণাক্ততা বেড়েছে ১৫.৮৮ শতাংশ। নড়াইল, যশোর ও গোপালগঞ্জে লবণাক্ততা একেবারেই ছিলনা। অথচ সেখানকার জমিতেও লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপকূল এবং তীরবর্তী এলাকায় ১৪ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকায় লবণাক্ত মাটি রয়েছে। এ অবস্থায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়লে লবণাক্ততা আরো ভিতরের দিকে আসবে এবং কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবে। লবণাক্ততা বর্ষা মৌসুমে ১০ শতাংশ থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে তা বেড়ে ৪০ শতাংশ হয় (দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ২০২০)। লবণাক্ততা বাংলাদেশে ক্রমেই বাড়ছে। ১৯৭৩ সালে লবণাক্ততাপূর্ণ অঞ্চল ছিল ৮৩.৩ মিলিয়ন হেক্টর্, ২০০০ সালে ১০২ মিলিয়ন হেক্টর এবং ২০০৯ সালে ১০৫.৬ মিলিয়ন হেক্টর এবং ২০১৯ সালে ১০৯.৮ মিলিয়ন হেক্টর (ইউএসবি এবং আইপিএস রিপোর্ট, ২০২০)।

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা এবং জোয়ারের উচ্চতা বৃদ্ধিঃ ধারণা করা হয় জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে। ফলশ্রুতিতে উপকূলীয় অঞ্চলে ভাঙনও বৃদ্ধি পেয়েছে। সমুদ্র ভাঙনের কবলে পড়ে কুতুবদিয়া ও সন্দ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বছরে যত পানি প্রবাহিত হয় তার ৯০ শতাংশের অধিক বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। বাংলাদেশে বন্যার প্রবণতা এমনিতেই বেশি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত বেড়ে বন্যার প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০ সালে দেশের উত্তরাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তিন দফা বন্যা হয়েছে। মধ্যাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলাও বন্যা কবলিত হয়েছে। বন্যায় ব্যাপক ফসলহানি, রাস্তা-ঘাটসহ অবকাঠামো, বসতবাড়ি এবং প্রাণিসম্পদের মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ইউএনডিপি ২০১৯ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৮ সালে চরচঙ্গা স্টেশন হাতিয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ৫.৭৩ মিলিমিটার এবং একই সময়ে হিরণ পয়েন্টে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে ৩.৩৮ মিলিমিটার।

জলবায়ু পরিবর্তনে জীববৈচিত্র্য ও উৎপাদনে প্রভাব: ভয়াবহ সিডরের কারণে সুন্দরবনের গাছপালার এবং জীববৈচিত্র্যের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে বহু বছর। নানামুখী কারণে প্রকৃতিগতভাবে যে খাদ্যচক্র তৈরি ছিল তার একটির ব্যাঘাত ঘটলেই চাপ পড়বে অন্যটির উপর। কারণ বিষয়গুলো একটি আরেকটির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

নদ-নদীর উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে দেশের প্রায় ১৪৩টি ছোট বড় স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে ৮০টি নাব্যতা ও প্রশস্ততা হারিয়ে খাল ও ক্যানেলে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে ৬৩টি নদীর অস্তিত্ব খুঁজেই পাওয়া যায় না। অযত্ন, অবহেলা, অবৈধ দখল ও পরিবেশ বিরোধী দুর্বৃত্তায়নের কারণে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, মধুমতি, গড়াই, কর্ণফুলী, সুরমাসহ দেশের বড় বড় নদীতে জেগে উঠেছে বড় বড় চর। বছরে দেশের প্রায় ৪ লাখ মানুষ নদীভাঙনসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে।

বৃষ্টিপাতের উপর প্রভাব: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের অস্বাভাবিক আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাত, দেরীতে বর্ষাকাল, স্বল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাত, অসময়ে বৃষ্টিপাত, ভারী বর্ষণ ইত্যাদি লক্ষ করা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ ২০০৯ সালের ২৮ জুলাই ঢাকায় রাতে ঘন্টায় ৩৩৩ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় যা ছিল বিগত ৬০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। এছাড়া ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রামে একই দিনে অবিরাম বৃষ্টি হয় এবং ৬ ঘন্টায় ৩০০ মি.মি. বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়, যার ফলে চট্টগ্রামে ভূমিধ্বস, বন্যা ও পাহাড় ধ্বসের মত ঘটনা ঘটেছে এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভারী বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হচ্ছে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: বঙ্গোপসাগরে পূর্বের তুলনায় ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এর তীব্রতা ও মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতি ৩ বছরে গড়ে একটি মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশে আঘাত হানে। বিগত ২৫ বছরে দেশে ১৪টি প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছে যার মূলে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর ভয়ানক এবং প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় "সিডর" ঘন্টায় ২২৩ কিলোমিটার বেগে বাংলাদেশে আঘাত হানে এবং এতে ৩,৩৬৩ এর অধিক লোকের প্রাণহানি ও অগণিত নিখোঁজ এবং অপূরণীয় ক্ষতি হয়। ২০০৯ সালের ২৫ মে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের খুলনা ও সাতক্ষীরাসহ উপকূলীয় জেলার ওপর দিয়ে ঘন্টায় ৯২ কিলোমিটার বেগে বয়ে যায় ঘূর্ণিঝড় আইলা, যাতে হাজার হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং ৫০ হাজারের অধিক লোক গৃহহারা হয়।

বন্যা: বাংলাদেশে জুলাই-আগষ্ট মাসে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা যাতে সাধারণত ২০ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়। কোনো কোনো বছর এই হার ৬৮ শতাংশ বা তার অধিক হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তিও ঘটছে। সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতি ১০ বছর পরপর বাংলাদেশে বড় ধরনের বন্যা হয় এবং বন্যায় প্লাবিত এলাকার পরিমাণও পূর্বের তুলনায় বেড়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৭ সালের বন্যায় ৪০ শতাংশ, ১৯৮৮ সালে ৬০ শতাংশ এবং ১৯৯৮ সালে দেশের ৭৫ শতাংশ এলাকা প্লাবিত হয়।

খরা: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে ও পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সাধারণত দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে কম। সাম্প্রতিক সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুকনো মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরো কমে গেছে এবং ঐসব এলাকায় খরা প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে। ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত এই দেশে ১৯ বার খরা লক্ষ করা গেছে, যা দেশের মোট আয়তনের ৪৭% এলাকায় প্রভাব ফেলছে (WARPO, ২০০৫)।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে বেশকিছু গবেষণা এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্যানেলের প্রতিবেদনেও বলা হয়েছে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত মারাত্মক হুমকির শিকার হবে। প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

- গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই শতকে আরও বৃদ্ধি পাবে।
- ২০৫০ সালের মধ্যে সুন্দরবনসহ বাংলাদেশের ১৭% ভূ-ভাগ তলিয়ে যাবে। ফলে ৪ কোটি লোক বাস্তুভিটা হারাবে এবং পেশা ও জীবিকা হারিয়ে অনিশ্চিত জীবন-যাপনে বাধ্য হবে। বেড়ে যাবে ভৌগোলিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্থিরতা ও সন্ত্রাস।
- ভয়াবহ বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

- বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা এবং সংখ্যা বেড়েছে। সাম্প্রতিকসময়ে সিডর, নার্গিস, আইলা, আম্পানসহ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, পাহাড় ধ্বস ইত্যাদি দুর্যোগ ঘন ঘন সংঘটিত হচ্ছে।
- শুষ্ক মৌসুমে সমুদ্রের লোনাপানি দেশের অভ্যন্তরে প্রায় ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত নদীতে প্রবেশ করছে। এই শতকে তা বেড়ে ৩০০-৪৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়বে।
- দেশের নদ-নদীর প্রবাহ কমে যাবে। বিগত ২০০ বছরে প্রায় ২৫০০ নদ-নদীর বিলুপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে যে ৩০০ নদীর অস্তিত্ব আছে তার মধ্যে মাত্র ১৬০টি নদী নাব্যতা কোনোমতে ধরে রেখেছে। নাব্যতা হারিয়ে ৩০০ নদ-নদীর অধিকাংশই আগামী ৫০ বছরে মৃতপ্রায় হয়ে যাবে, অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম করতে হবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনার মত বড় নদীগুলোকেও।
- উদ্ভিদ ও প্রাণিবৈচিত্র্য ভারসাম্যহীন হয়ে পড়বে।

জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজন কৌশল

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ভূমিকা অতি নগণ্য হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। Inter Governmental Panel on Climate Change (IPCC) এর সমীক্ষায় দেখা গেছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা এক মিটার বাড়লে বাংলাদেশে আবাদি জমি নষ্ট হবে প্রায় ১৪ শতাংশ, ২৮-৩০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস হতে পারে, জলমগ্ন হতে পারে আরও প্রায় ১৫.৮ শতাংশ জমি। এর মধ্যে বৃহত্তর খুলনা জেলার ৬৫ ভাগ, বরিশালের ৯৯ ভাগ, পটুয়াখালীর ১০০ ভাগ, নোয়াখালীর ৪৪ ভাগ এবং ফরিদপুরের ১২ ভাগ এলাকা ডুবে যেতে পারে। ফলে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষকে জলবায়ু উদ্বাস্তু হয়ে উঁচু অঞ্চলে অভিগমণ করতে হবে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলসমূহ অনুসরণ করা যেতে পারে:

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় দূরদর্শী অভিযোজন কৌশল।

২। বিপন্ন খাতের সাথে অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল।

৩। আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে অভিযোজনের কৌশল।

৪। স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজনের কৌশল।

১। প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ মোকাবেলায় দূরদর্শী অভিযোজনের কৌশল: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সাইক্লোন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, জলাবদ্ধতা, বন্যা ও লবণাক্ততা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সংখ্যা এবং তীব্রতা বেড়ে যাবে। এসব সঙ্কট মোকাবেলায় নিম্নোক্ত অভিযোজনের কৌশলসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১.১। সাইক্লোন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডোর মাত্রা রোধকল্পে:

- গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার পরিবর্তে বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উপকূলীয় এলাকায় বিভিন্ন ধরনের বনায়ন করতে হবে। যেমন: উপকূলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সৃষ্টি করা যেতে পারে। জোয়ারের ঠিক বাইরের এলাকায় বিভিন্ন স্তরের (উচ্চতার) বন সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- বাতাসের বেগ কমাতে স্বল্প দূরত্বে গাছ লাগানো যেতে পারে এবং
- বাঁশ জাতীয় বন সৃষ্টি করতে হবে।

১.২। জলাবদ্ধতা ও বন্যা রোধে:

- উঁচু স্থানে বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী গৃহ নির্মাণ করতে হবে।
- ভাসমান কৃষি পদ্ধতির প্রসার ঘটাতে হবে।

১.৩। মাটি ও পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি রোধকল্পে:

- মাটির গুণাগুন পরীক্ষা করে ফসল নির্বাচন করতে হবে। এক্ষেত্রে লবণ সহিষ্ণু ফসলের জাত নির্বাচন করতে হবে।
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১.৪। গৃহ ও কৃষি কাজে মিষ্টি পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে:

- পুকুর, ডোবা, খাল ও নদী খনন / পুনর্খনন করতে হবে।
- গভীর নলকূপ স্থাপন করতে হবে।
- বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১.৫। নদীর উপকূল ক্ষয় হ্রাস করতে:

- ম্যানগ্রোভ বনায়ন, জলধারণ এলাকা (Water Shade) ব্যবস্থাপনা, নদী তীরে পাম জাতীয় গাছ ও কাশ ভার্টিভার জাতীয় তৃণ ও বনজ উদ্ভিদ রোপণ করা যেতে পারে।

১.৬। মাছের আবাস পরিবর্তন ও মৎস্য সম্পদ রক্ষায়:

- নদী ও সমুদ্র দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।
- ডিমপাড়া মৌসুমে মাছ ধরা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

১.৭। খরা রোধে:

- বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচি জোরদারের মাধ্যমে প্রচুর বনায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
- নির্বিচারে বৃক্ষ নিধন বন্ধ করতে হবে।

২। **বিপন্ন খাতের অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল:** জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত সঙ্কট সৃষ্টির পাশাপাশি কৃষি, জীববৈচিত্র্য, পানি, জনস্বাস্থ্য, খাদ্য ও অবকাঠামো প্রভৃতি খাতকেও বিপন্ন করে। এই ক্ষেত্রে অভিযোজনের যে সকল সুযোগ ও কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিম্নরূপ:

	বিপন্নখাত	অভিযোজনের সুযোগ ও কৌশল
২.১।	কৃষি	• প্রতিকূল পরিবেশ উপযোগী ফসলের জাত উদ্ভাবন • তাপ ও ঠাণ্ডা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন • খরা মোকাবেলায় পদক্ষেপ গ্রহণ • টেকসই উৎপাদন ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন
২.২।	জীববৈচিত্র্য	• প্রতিবেশভিত্তিক সংরক্ষণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ • সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাপনার স্বার্থে জীববৈচিত্র্য সংকটাপন্ন এলাকাসমূহ সংরক্ষণ এবং ব্যবহারভিত্তিক অঞ্চলে বিভক্তকরণ • সংকটাপন্ন প্রাণি ও উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ সনাক্ত করে তাদের সংরক্ষণে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ • গবেষণার মাধ্যমে সংরক্ষণের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার।
২.৩।	পানি	• লবণাক্ত ও আর্সেনিক দূষণ এলাকার জন্য বৃষ্টির পানি ধরে রাখার কৌশল ও ব্যবস্থা গ্রহণ • শুষ্ক মৌসুমে সুপেয় পানির প্রাপ্যতার জন্য কমিউনিটি পুকুর খনন ও রক্ষণাবেক্ষণ • শিল্পবর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন করা।
২.৪।	জনস্বাস্থ্য	• জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকির মাত্রানুযায়ী ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ • বিশুদ্ধ পানি ও উন্নত পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে • পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
২.৫।	খাদ্য নিরাপত্তা	• পর্যাপ্তসংখ্যক খাদ্যগুদাম ও কোল্ড ষ্টোরেজ তৈরি করে খাদ্যের মজুদ ও সংরক্ষণ করতে হবে • ফসল উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে খাদ্যাভাস পরিবর্তন করতে হবে।
২.৬।	অবকাঠামো	• ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক্ষম আবাসন গড়ে তুলতে হবে • মাছ ধরার নৌকার কাঠামো আধুনিকায়ন করতে হবে • স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জলাশয় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। **আর্থ-সামাজিক পর্যায়ে অভিযোজন:** বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধানকল্পে স্থানীয় প্রকৃতিকে গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিত নীতিমালায় সেই সব উপকূলীয় জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যারা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। এক্ষেত্রে নীতিমালায় যে বিষয়গুলোর উপর জোর দেওয়া দরকার-

৩.১ দারিদ্র্য বিমোচন।

৩.২ সম্পদের যৌথ ব্যবস্থাপনার অধিকারকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া।

৩.৩ উপকূলীয় সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে।

৩.৪ উপকূলীয় সম্পদ সংরক্ষণে মানব সম্পদ উন্নয়ন যার জন্য উপকূল বিষয়ে বিশেষায়িত ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন।

৩.৫ সামষ্টিক নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে।

৪। **স্থানীয় পর্যায়ে অভিযোজন:** স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে পরিবেশ বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞগণ উপকূলীয় জনপদে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি কমাতে নিম্নোক্ত অভিযোজন কৌশল সুপারিশ করেছেন:

৪.১ উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণ;

৪.২ হাঁস পালন;

৪.৩ চাষের জন্য লবণাক্ততা সহনীয় ফসল নির্বাচন;

৪.৪ ভাসমান বাগান করতে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ:

৪.৫ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৬ লবণাক্ত এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪.৭ মাছ ধরতে যাবার সময় জেলেদের নৌকায় রেডিও রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরের ক্ষতি সাধনের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নানাধরনের অভিযোজন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে প্রধান চারটি পর্যায়ে। এর মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং বিপন্ন খাতসমূহকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

পাঠ-৩.৫ বাংলাদেশের বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য
Forest Area and Biodiversity of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বনাঞ্চল ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- জীববৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মায়োসিন স্তরে প্রাপ্ত নিকটবর্তী অঞ্চলের জীবাশ্ম গবেষণায় দেখা যায় যে, টারশিয়ারি যুগে বাংলাদেশের অংশবিশেষ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অরণ্যে ঢাকা ছিল। টারশিয়ারি যুগের পর প্লাইস্টোসিন যুগে হিমযুগ এবং আন্ত:হিম যুগের জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন এর কারণে উদ্ভিদকূলের ব্যাপক ক্ষতিসাধিত হয়। সাধারণত যে কোন দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের শতকরা ২৫ ভাগ বনভূমি প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৬ মিলিয়ন হেক্টর যা বাংলাদেশের মোট ভূমির ১৭.৪৬ শতাংশ। তন্মধ্যে ১.৬ মিলিয়ন বাংলাদেশের বন বিভাগ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় (বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ)।

বাংলাদেশের বনাঞ্চল:

সাধারণভাবে, ০.৫ হেক্টরের অধিক জমি জুড়ে বিস্তৃত এবং ৫ মিটারের অধিক উচ্চতার বৃক্ষ সম্বলিত এবং ১০ শতাংশের অধিক ক্যানপি আচ্ছাদিত এলাকাকে বন বলা হয়। বাংলাদেশের শহর, নগর এবং কৃষি ভূমিতে যে সকল গাছ জন্মায় তা অবনজ গাছ হিসেবে বিবেচিত হয় (বন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ)। বাংলাদেশের বনভূমিকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১। ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন বা পাহাড়ী বন,
২। ক্রান্তীয় আর্দ্র পাতাঝরা বন বা শালবন,
৩। ম্যানগ্রোভ বন বা প্রাকৃতিক সুন্দরবন,
৪। উপকূলীয় বনায়ন,
৫। জলা বনভূমির বনায়ন।

১। **ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনাঞ্চল বা পাহাড়ী বনাঞ্চল:** চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, কক্সবাজার, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং হবিগঞ্জের পাহাড়ী এলাকা এই বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এ বনভূমির আয়তন প্রায় ১৩,৭৭,০০০ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৯.৩৩ শতাংশ। এই বনভূমির উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহ হলো- গর্জন, চাপালিশ, তেলসুর, উড়িআম, ঢাকিজাম, সিভিট, সেগুন, গামার, চম্পা, জারুল, বৈলাম প্রভৃতি। এছাড়াও এ বনাঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হাতি, চিতাবাঘ, বন্যশুকর, হরিণ, বানর, উল্লুক এবং অজগর। বনের পাখির মধ্যে রয়েছে উদয়ী পাকরা ধনেশ, বড় র‍্যাকেট ফিঙ্গে, পাতি-ময়না, গলাফোলা এবং ছাতারে। এই বনের গাছপালা সারাবছরই চিরসবুজ থাকে। উচ্চতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার উদ্ভিদ ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় ছাউনি (ক্যানপি) সৃষ্টি করে।

২। **ক্রান্তীয় আর্দ্র পাতাঝরা বনাঞ্চল বা শাল বনাঞ্চল:** এই বনাঞ্চল গাজীপুর, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও শেরপুর জেলায় অবস্থিত। এছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলের দিনাজপুর, রংপুর, নওগাঁ, ঠাকুরগাঁও এবং পঞ্চগড় জেলায় সীমিত সংখ্যক শালবন রয়েছে। এই বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ১,২০,০০০ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ০.৮১ শতাংশ। এই বনাঞ্চলের মূল উদ্ভিদ শাল প্রজাতি। শুষ্ক মৌসুমে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) শালগাছের পাতা ঝরে যায় বলে একে পত্রঝরা বনও বলা হয়। এছাড়াও রয়েছে হরিতকি, বহেরা, কড়ই, শিমুল, অর্জুন প্রভৃতি। বন্য প্রাণীসমূহের মধ্যে মেছোবাঘ, বনবিড়াল, বানর, শিয়াল, বেজি, হনুমান, সজারু, ঈগল, কাঠবিড়ালী, সাপ, ধলাকোমর, শ্যামা, লাল বন মুরগী, সবুজ ঠোঁট মালকোয়া, তিলা-নাগঈগল উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে রাবারচাষ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

৩। **প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল (সুন্দরবন):** পৃথিবীর একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, 'সুন্দরবন'। এর আয়তন প্রায় ৬,০১,৭০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ৪.১৩ শতাংশ। সুন্দরি, গেওয়া, কেওড়া, পশুর, বাইন, প্রধান বৃক্ষ প্রজাতি। সুন্দরবনের ৩টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নিয়ে গঠিত ১,৩৯,৭০০ হেক্টর বনাঞ্চলকে ইউনেস্কো ১৯৯৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেছে। এই বনাঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদীগুলো হলো পশুর, শিবসা, বলেশ্বর এবং রায়মংগল। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার, হরিণ, বানর, শুকর, কুমির, ডলফিন, গুইসাপ, অজগর, হরিয়াল, বালিহাঁস, গাংচিল, বক, মদনটাক, মরালিহাঁস, চখা, ঈগল, চিল, মাছরাঙা ইত্যাদি। এই বনাঞ্চল মৎস্য সম্পদেও সমৃদ্ধ। ইলিশ, লইট্টা, ছুরি, পোয়া, রূপচাঁদা, ভেটকি, পারসে, গলদা, বাগদা, চিতরা প্রভৃতি মাছ পাওয়া যায়।

৪। **উপকূলীয় বনায়ন:** উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চরভূমিতে ১৯৬৫ সাল থেকে এ বন সৃষ্টি করা হচ্ছে। নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় এলাকা এ বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। এই বনকে প্যারাবনও বলা হয়। এই বনাঞ্চলের আয়তন প্রায় ১,৯৬,০০০ হেক্টর যা দেশের আয়তনের ১.৩৬ শতাংশ। প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলের মতো এই বনও জোয়ার-ভাটায় প্লাবিত হয়। উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী হচ্ছে হরিণ, মেছোবাঘ এবং শিয়াল। বন্যপাখির মধ্যে রয়েছে কালালেজ জৌরালী, দেশি গাঙচষা, কালামাথা কাস্তেচরা, খয়রাপাখ মাছরাঙা।

জলাভূমির বন: সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার হাওড় ও বিল জলাভূমি বনাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। সিলেট জেলার গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত রাতারগুল জলাভূমি বনাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রাতারগুলের আয়তন ২০৪.২৫ হেক্টর। প্রধান বৃক্ষ প্রজাতিসমূহ হলো- হিজল, করচ, পিটালী, বরুন ইত্যাদি। বছরের প্রায় অর্ধেক সময় এ বনের গাছ পানিতে আংশিক ডুবে থাকে। বানর, মেছোবাঘ, ভোদড়, কাঠবিড়ালী সাপ, উল্লেখযোগ্য বন্যপ্রাণী। এই বনাঞ্চলও মাছের আবাসস্থলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

উদ্ভিদ ও প্রাণির নির্দিষ্ট পরিবেশে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে জীবমণ্ডল। এই জীবমণ্ডলের জীব বৈচিত্র্য সমগ্র পৃথিবীতে বসবাসরত মানব পরিবেশকে মানুষের বসবাসের জন্য টিকিয়ে রেখেছে। পৃথিবীতে বসবাসরত সকল জীবসমূহের সংখ্যা, একটি থেকে অন্যটির পার্থক্য এবং প্রাচুর্যতাকে এককথায় জীববৈচিত্র্য বা Biodiversity বলে। বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি দেশ। তবে বৈশ্বিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণি বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং কিছু সংখ্যক প্রজাতি এখনও হুমকির সম্মুখীন এবং বিলুপ্ত হওয়ার পথে।

জীববৈচিত্র্যতার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

জীববৈচিত্র্যতা জীবিত প্রজাতির বৈচিত্র্যতা এবং তাদের বসবাসকৃত পরিবেশের ধারণা প্রদান করে। আমেরিকার জীব বিজ্ঞানী ই.এ. নরসে (E. A. Norse) এর মতে, জীববৈচিত্র্য হলো জল, স্থল সকল জায়গায় সকল পরিবেশে থাকা সকল ধরনের জীব এবং উদ্ভিদের বৈচিত্র্যতা। জীববৈচিত্র্যতাকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

১। জিনগত বৈচিত্র্য বা বংশগতীয় বৈচিত্র্য;
২। প্রজাতিগত বৈচিত্র্য এবং
৩। বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

১। **জিনগত বা বংশগতীয় বৈচিত্র্য:** উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বিভিন্ন প্রজাতির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য নির্দিষ্ট জীন থাকে। জীন বংশগতির ধারক ও বাহক। বিভিন্ন কারণে জীনের গঠন ও বিন্যাসের পরিবর্তনের কারণে জীবের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে এবং নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটে। এভাবে জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ঘটে তাকে বংশগতীয় বৈচিত্র্য বলে।

২। **প্রজাতিগত বৈচিত্র্য:** একই প্রজাতি অথবা বিভিন্ন প্রজাতির অন্তর্গত সদস্য সমূহের মধ্যে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। বহু প্রজাতি পরিবেশগত বির্পযয়ের কারণে প্রকৃতির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারায় বিলুপ্ত হয়েছে।

৩। **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্যঃ** বসবাসকৃত পরিবেশের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরিবেশের জৈব সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে যে জৈব বৈচিত্র্যেতার সৃষ্টি হয় তাকে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলে।

জীববৈচিত্র্যতার সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের প্রত্যেকটি বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণির প্রজাতিগত, বংশগতীয় এবং পরিবেশগত ভিন্নতা থাকার কারণে জীববৈচিত্র্যতার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে সময়ের সাথে সাথে পরিবশগত পরিবর্তনের কারণে বহু প্রজাতি আঞ্চলিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই কারণে বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে অর্থাৎ জৈব বৈচিত্র্যতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ২০১৫ সালের IUCN এর লাল তালিকা (Red list) অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ১,৬১৯টি প্রজাতি নির্ধারণ করা হয়েছে তন্মধ্যে ৩১টি প্রজাতি (২%) আঞ্চলিকভাবে বিলুপ্ত, ৫টি প্রজাতি (৩.৮%) গুরুতর বিপন্ন, ১৮১ প্রজাতি (১১%) বিপন্ন, ১৫ প্রজাতি (৯.৪%), ক্ষতিগ্রস্ত, ৯০ প্রজাতি (৬%) এবং ৮০২ প্রজাতি (৫০%) হুমকির মুখে। IUCN এর লাল তালিকা অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে ৩৮ প্রকৃতির স্তন্যপায়ী প্রাণি, ৩৯ প্রজাতির পাখি, ৩৮ প্রজাতির সরীসৃপ, ১০ প্রজাতির অ্যাম্ফিবিয়ান, ৬৪ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ ১৩ প্রজাতির ক্রাসটেসিয়ান এবং ১৮৮ প্রজাতির প্রজাপতি সারাদেশে হুমকির মুখে রয়েছে।

জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য দেশে সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৬,৩৬,৩৯০.৪৬ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৪.১৩ শতাংশ (বন অধিদপ্তর, ২০২০)। সারাদেশে রয়েছে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি অভয়ারণ্য এবং বিশেষ তিনটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং বিভাগ অনুযায়ী শকুনের নিরাপদ প্রজনন ও সংরক্ষণ এলাকা। এই বিশেষ তিনটি সংরক্ষিত এলাকাসমূহ হলো- রাতারগুল (সিলেট), আলতাদীঘি (নওগাঁ) এবং সোয়াচ অব নো-গ্রাউণ্ড (দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর)। এছাড়াও গাজীপুর জেলায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাফারি পার্ক, চট্টগ্রাম জেলায় শেখ রাসেল অ্যাভিয়ারি অ্যান্ড ইকোপার্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হলো - বন্যপ্রাণি সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২, জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০ এবং টাইগার এ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯-২০১৭। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য রয়েছে বাংলাদেশে বিশেষ জীববৈচিত্র্য অঞ্চল, শকুন নিরাপদ অঞ্চল, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সাফারি পার্ক প্রভৃতি।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে মোট বনভূমির পরিমাণ ২.৬ মিলিয়ন হেক্টর যা বাংলাদেশের মোট ভূমির ১৭.৪৬ শতাংশ। বাংলাদেশের বনাঞ্চলকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় যথা- ১) ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন বা পাহাড়ী বন, ২) ক্রান্তীয় আর্দ্র পাতাঝরা বন বা শালবন, ৩) ম্যানগ্রোভ বন বা প্রাকৃতিক সুন্দরবন, ৪) উপকূলীয় বনায়ন এবং ৫) জলাভূমির বন। প্রত্যেকটি বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ। বনাঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণির প্রজাতিগত, বংশগতীয় এবং পরিবেশগত জীববৈচিত্র্যতা রয়েছে। সময়ের সাথে সাথে পরিবশগত পরিবর্তনের কারণে বহু প্রজাতি আঞ্চলিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই কারণে বন ও বন্যপ্রাণি সংরক্ষণে অর্থাৎ জৈব বৈচিত্র্যতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জীববৈচিত্র্যতা রক্ষণের জন্য দেশের রক্ষিত এলাকার পরিমাণ ৬,৩৬,৩৯০.৪৬ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের ৪.১৩ শতাংশ। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশে বিশেষ জীববৈচিত্র্য অঞ্চল, শকুন নিরাপদ অঞ্চল, ইকোপার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন, সাফারি পার্ক প্রভৃতি রয়েছে । এছাড়াও সারাদেশে রয়েছে ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২০টি অভয়ারণ্য এবং বিশেষ তিনটি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা এবং বিভাগ অনুযায়ী শকুনের নিরাপদ সংরক্ষণ ও প্রজনন এলাকা। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হলো - বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২, জানমালের ক্ষতিপূরণ নীতিমালা ২০১০ এবং টাইগার এ্যাকশন প্ল্যান ২০০৯-২০১৭।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক কাঠামোর বিবরণ দিন। প্লাবন সমভূমির শ্রেণিবিন্যাস এবং গঠন আলোচনা করুন।
(Describe the Physiographic structure of Bangladesh. Classify and describe the formation of Plainland in Bangladesh.)

২. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান লিখুন। বাংলাদেশের অধিক উচ্চতার পাহাড়সমূহ কোথায় কোথায় অবস্থিত? বিবরণ দিন ।
(Write the Geographic Location of Bangladesh. Define and briefly describe the top most Hilly area of Bangladesh.)

৩. জলবায়ু কাকে বলে? বাংলাদেশের জলবায়ু ও তার উপাদানসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।
(What is climate? Briefly describe the elements of climate in Bangladesh)

৪. বাংলাদেশের তাপমাত্রার বৈচিত্র্যতা বর্ণনা করুন এবং জলবায়ুর উপর এর প্রভাব আলোচনা করুন।
(Describe the variation of temperature and its effects of climate in Bangladesh.)

৫. নদী ব্যবস্থা কাকে বলে? বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাকে কত ভাগে বিভক্ত করা যায় এবং কী কী? গঙ্গা-পদ্মা নদী ব্যবস্থা বর্ণনা করুন।
(Give the definition of river system? How many types of river system in Bangladesh. What are they? Describe briefly the Ganga-Padma river system.)

৬. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল আলোচনা করুন। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় কি কি অভিযোজনের কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে?
(Describe the result of climate change in Bangladesh. Define the adaptation techniques in Bangladesh against natural hazards.)

৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে প্রধান বিপন্ন খাত সমূহ কী কী? জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কিরূপ প্রভাব পড়তে পারে?
(Define the main effected sectors in Bangladesh which are caused by climate change. What will be the effects of climate change in Bangladesh.)

৮. বনাঞ্চল কাকে বলে ? বাংলাদেশের বনাঞ্চল বর্ণনা করুন ।
(Give the definition of forest area. Briefly describe the forest area of Bangladesh.)

৯. জীববৈচিত্র্য কাকে বলে? কত প্রকার ও কী কী? বর্ণনা করুন।
(What is biodiversity? How many types biodiversity and what are they? Describe briefly.)